তারিখ 25 APR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সংবাদ

খুমেক হাসপাতাল হ-য-ব-র-ল

শুভ্র শচীন, খুলনা

দালাল নিয়ন্ত্রণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও অফিস ব্লকে লাগানো হয়েছিল সিসি (ক্লোজ সার্কিট) ক্যামেরা। পরিকল্পনা ছিল বহির্বিভাগেও সিসি ক্যামেরা লাগানোর। কিন্তু সে পরিকল্পনাতো বাস্তবায়ন হয়ইনি বরং গত বছর লাগানো ওই সিসি ক্যামেরাগুলো এখন অকেজো।

এমনিভাবে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে যাতে কেউ প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে না পারে তা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক গত বছরের ৯ ডিসেম্বর এক অফিস অর্ডার করে শুধুমাত্র থানা ও আদালত থেকে চাওয়া ইনজুরি সার্টিফিকেটই রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশ দিলেও তাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। মেডিসিন স্টোর থেকে বেড়েছে ওষুধ চুরি। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কতিপয় ফার্মাসিষ্ট। অপারেশন থিয়েটারসহ কিছু ওয়ার্ডে সরবরাহকৃত ওষুধপত্র রোগীদের বাইরে থেকে কিনে আনার বাধ্যকতাও রয়েছে এ হাসপাতালে। ব্লাডব্যাংক ও প্যাথলজি বিভাগে চলছে চরম দুর্নীতি। দীর্ঘদিনের চিহ্নিত কতিপয় দুর্নীতিবাজের হাতে এ দুই বিভাগ জিম্মি। এমনিভাবে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলছে পদ্মার এপারের গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত খুমেক হাসপাতালটি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি ৫শ' বেডের হলেও এখনও আড়াইশ' বেডের জনবল দিয়েই চলছে। অথচ প্রতিদিন রোগী থাকছে প্রায় ৮শ'। ৫শ' বেডের জন্য এক হাজার ছয়শ' জনবলের প্রয়োজন হলেও রয়েছে মাত্র চারশ'। আবার এ ৪শ' জনবলের মধ্যে অধিকাংশ চিকিৎসককেই সকাল ৮টার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সকাল ৮টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ডিউটির কথা থাকলেও অধিকাংশ ডাক্তারকে বেলা ১১টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পাওয়া যায় হাসপাতালে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আসা একটি প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতেও। খুলনা মেডিকেল কলেজের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে কলেজ ও হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন চাহিদার কথা তুলে ধরা হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

বিগত দিনে অর্থের বিনিময়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেয়ার প্রবণতা থাকায় হাসপাতালের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ছিল অনেকের। হাসপাতালের যিনি আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) থাকেন তিনিই বরাবর সার্টিফিকেট কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অপর দু'জন সদস্যের মধ্যে একজন সংশ্লিষ্ট ইএমও ও অপরজন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সহকারী রেজিস্ট্রার থাকতেন। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক যোগদানের পর আরএমওকে সার্টিফিকেট কমিটির সভাপতি রাখা হলেও একজন ইএমও ও বহির্বিভাগের একজন মেডিকেল অফিসারের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। এ নিয়েও অনেকটা বিতর্ক রয়েছে। কারণ বহির্বিভাগের যে চিকিৎসক রোগী ভর্তির সঙ্গে অথবা চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত নন তিনি কিভাবে সার্টিফিকেট কমিটির সদস্য হন এমন প্রশ্নও দেখা দেয়। তার পরেও সরাসরি না দিয়ে আদালত বা থানা থেকে চাহিদা অনুযায়ী রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য গত ৯ ডিসেম্বর একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। হাসপাতালের রেকর্ডে দেখা যায়, ডিসেম্বরে ৪২টির স্থলে ১০টি, জানুয়ারিতে ৫৪টির স্থলে ১২টি, ফেব্রুয়ারিতে ৫২টির স্থলে ১০টি এবং মার্চে ৪৫টির স্থলে ছয়টি সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়। আবার এপ্রিলের সাত দিনে ২৭টি চাহিদা আসলেও একটি সার্টিফিকেটও দেয়া হয়নি।

অথচ কতিপয় চিহ্নিত দালালের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে সরাসরি সার্টিফিকেট মেলে এখানে। ৩২৬ ধারার সার্টিফিকেটের জন্য পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয় এমনটিও জনশ্রুতি রয়েছে। এছাড়া ৩২৩, ৩২৪ ও ৩২৫ ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সার্টিফিকেটের জন্য নেয়া হয় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। সার্টিফিকেটের দালাল হিসেবে একজন হাসপাতালের কুক মশালচি হিসেবে কর্মরত থাকলেও অপর দু'জন হাসপাতালের কর্মচারীই নন। একজন নিজেকে এক চিকিৎসক নেতার পোষ্যপুত্র হিসেবে পরিচয় দেয় অপরজন হাসপাতালের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পুত্র। যিনি হাসপাতালের পশ্চিম পাশে একটি ক্লিনিক করেছেন বলেও জানা যায়।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ আনন্দ মোহন সাহা বলেন, তিনি অফিস আদেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সার্টিফিকেট দিতে হবে। এরপরেও যদি কেউ সরাসরি সার্টিফিকেট দেন তার দায়-দায়িত্ব তার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নয়।

ইনজুরি সার্টিফিকেটের পাশাপাশি হাসপাতালের বহির্বিভাগে দালালদের মাধ্যমে বাইরের ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী ভাগিয়ে নেওয়া, ভর্তি রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ওয়ার্ডের ডাক্তারদের মাধ্যমে বাইরে পাঠানো, খাবারে অনিয়ম ও সিসিতে ভর্তি না করে ওয়ার্ডে ভর্তির মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান, অপমৃত্যু হলেও ময়না তদন্ত না করে অর্থে বিনিময়ে লাশ ছেড়ে দেয়া, রোস্টার বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতি এখন অনেকটা ওপেন সিক্রেট হলেও কর্তৃপক্ষের যেন কোন মাথা ব্যথা নেই। এমনকি দালাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি স্থানীয় কিছু ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব দেয়া হলেও তারাই প্রকারান্তরে দালালদের কাছ থেকে মাসোহারা আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে।